অপরায়নের রাজনীতি: বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদীদের ডিসকোর্সে ইসলামপন্থা

Shihan Bin Umar

শাহবাগ আন্দোলন ও এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শাপলা আন্দোলনকে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে সন্ধিক্ষণ বলা যায়। ২০১৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী শুরু হওয়া শাহবাগ আন্দোলন যদিও প্রথমে ১৯৭১ সালের তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদন্ডের দাবীতে ছিল, কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশে ধর্মের নামে রাজনীতি তথা ইসলামপন্থী রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী উঠে শাহবাগে। সেই সাথে শাহবাগ আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা কিছু চিহ্নিত উগ্র নাস্তিকদের (militant atheists) অবস্থানের কারণে শাহবাগ আন্দোলন দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। শুরু হয় শাহবাগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শাপলা আন্দোলন। শাপলা আন্দোলন ১৩ দফা দাবী পেশ করে। যদিও শাপলা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বারবার বলে আসছিলেন যে, তাদের আন্দোলন কোন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, কিন্তু স্বভাবতই তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দাবীসমূহের গভীর রাজনৈতিক দ্যোতনা ছিল। যার ফলে আওয়ামী সরকার ৫ই মে গভীর রাতে তাদের উপর নৃশংস ক্র্যাকডাউন করে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, শাহবাগ আন্দোলনের মূল দাবী ছিল ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত কিছু শীর্ষ জামায়াত নেতার মৃত্যুদন্ড। এ দাবী তথা আন্দোলন পরবর্তীতে বাংলাদেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও সঙ্কট গড়ে তুলতে যে অবদান রেখেছে সেটি এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। শাহবাগ আন্দোলনের অনেক তাত্ত্বিকগণই এটিকে বাংলাদেশকে পুনরায় তার প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শ তথা বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের উপর দাঁড় করানোর আন্দোলন হিসেবে অভিহিত করেছেন। সেই সাথে তাদের অনেকেই শাপলা আন্দোলন ও বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির যে ইসলামাইজেশনের ফল এই শাপলা আন্দোলন, তাকে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাকালীন আদর্শের প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছেন; সেই সাথে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ যে গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন তা স্বীকার করেছেন। ইসলামপন্থার বরাবর দাঁড়িয়ে বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ কেন সঙ্কটের সম্মুখীন তা বিশ্লেষণ করাই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

শাহবাগ আন্দোলনের সমর্থক বাংলাদেশের সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিগণের মতে, ৭১-এর স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের যে প্রতিষ্ঠা ঘটে, ৭৫-এ বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়া এবং পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান ও হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের সময় সংবিধানে আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সংযোগ, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মকরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে তার সেক্যুলার ভিত্তি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী রাজনৈতিক দল গত ১৪ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকার সুবাদে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশকে আবার এর তথাকথিত 'সেক্যুলার' ভিত্তির ওপর ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হলেও, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ইসলামীকরণ হওয়ায় অনেক সময়ই সেক্যুলার বুদ্ধিজীবি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারটিকে বাঙ্গালী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে একটি হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করে দিয়ে আসছেন। এই ইসলামীকরণের আলামতের মধ্যে বোরখার ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া থেকে শুরু করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ডের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদিকে চিহ্নিত করা হয়। এগুলোকে তারা স্রেফ সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ হিসেবে দেখছেন না, এগুলোর রাজনৈতিক দ্যোতনা আছে বলে তারা মনে করছেন।

বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের ধারকবাহকদের এই ভীতির পিছনে রয়েছে এ মতাদর্শের সঙ্কট। বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদে শুরু থেকেই একটি আদর্শিক শূন্যতা বিরাজ করছিল। পূর্ব বাংলায় যে রাজনৈতিক দলের হাত ধরে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্ফূরণ ঘটেছিল সেটি হচ্ছে আওয়ামী লীগ। আর এই আওয়ামী লীগের জন্ম মুসলিম লীগের পেট থেকে। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হলে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের এলিটদের শাসনভুক্ত হতে হবে এবং তাতে যে মুসলিমদের বঞ্চনার শিকার হতে হবে এই অনুভূতি থেকেই মুসলিম লীগের জন্ম ও আন্দোলন। সূচনাকালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মত ব্রিটিশ রাজের প্রতি অনুগত থেকে বিভিন্ন সরকারী সুযোগ-সুবিধায় মুসলিমদের সমান অধিকার দাবী করা ও তা নিশ্চিত করার মধ্যেই মুসলিম লীগের আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে এ আন্দোলন মুসলিমদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের উপর ভিত্তি করে মুসলিমদের জন্য আলাদা বাসভূমির দাবীতে রূপান্তরিত হয়। মুসলিম লীগের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও সেটার ভিত্তিতে মুসলিমদের আলাদা বাসভূমির দাবীটা নিঃসন্দেহে প্রচন্ড যৌক্তিক হলেও, নতুন মুসলিম দেশ পাকিস্তানকে সে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের আদলে গড়ে তোলার সদিচ্ছা ও যোগ্যতা ব্রিটিশ

কলোনিয়াল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হওয়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। মুসলিম লীগকে তৎকালীন পরিস্থিতির আলোকেই উপমহাদেশের 'হিন্দু' অপরায়নের রাজনীতি করতে হয়েছে। পাকিস্তান আন্দোলনে অনেক ইসলামী শ্লোগান ব্যবহৃত হলেও, কার্যত পাকিস্তানকে কিভাবে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তোলা হবে সেটার কোন নীলনকশা মুসলিম লীগের কাছে ছিল না। সূচনাকালে ব্রিটিশ রাজের অধীনে মুসলিমদের হিন্দুদের সমান অধিকারের দাবীতে অভ্যস্ত মুসলিম লীগের প্রভাবশালী অংশটির মধ্যে পাকিস্তানের ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল এতটুকুতে যে, এ দেশে মুসলিমরা হিন্দুদের প্রভাবের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে জাগতিক উন্নতি করতে পারবে। কিন্তু পাকিস্তানকে নতুন মদীনা হিসেবে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা আল্লামা ইকবাল দেখতেন, সেটা গড়ে তোলার যোগ্যতা, সদিচ্ছা ও সাহস নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ছিল না।

এর ফল যেটা হল যে, পাকিস্তান হওয়ার কিছুকাল পরেই আভ্যন্তরীণ ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দিতায় পিছিয়ে পড়ে সোহরাওয়ার্দী, ভাসানীসহ পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কিছু সুপরিচিত নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক আওয়ামী লীগ মুসলিম লীগ গড়ে তোলেন, যা পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে পরিণত হয়। মুসলিম লীগে অপরায়নের রাজনীতিতে অভ্যস্ত এসব নেতৃবৃন্দ ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মুসলিম শ্রেণী পাকিস্তান হওয়ার পরও অপরায়নের রাজনীতি-সংস্কৃতি থেকে বের হতে পারল না। ফলে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দাবীতে এরাই অবাঙ্গালী পাকিস্তানীদের অপরায়নে মশগুল হয়ে পড়লেন। মূলত পূর্ব পাকিস্তানে বিকশিত বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের ভিত্তিই দাঁড়িয়ে আছে অবাঙ্গালী পাকিস্তানীদের অপরায়নের উপর। এই প্রবণতা এতটাই প্রবল ছিল যে, কয়েক বছর পূর্বে অর্থাৎ প্রাক ৪৭-এ কলকাতাভিত্তিক যে বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণীকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দী ভাবত বাঙ্গালী মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সেই ভদ্রলোক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক পণ্যকেই তারা অবাঙ্গালী পাকিস্তানীদের অপরায়নের প্রক্রিয়া তথা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের স্বতন্ত্রবাদী রাজনীতি ও সংস্কৃতির স্ফূরণে নিজেদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করল।

অবশেষে ৭১-এ যখন দেশ স্বাধীন হল, তখন অপরায়ন করার মত কাউকে পাওয়া গেল না। এর ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে ধরনের আদর্শিক শূন্যতা দেখা দেয়। তবে বাংলাদেশের এই আদর্শিক শূন্যতা ৪৭-পরবর্তী পাকিস্তানের আদর্শিক শূন্যতার চেয়েও প্রবল ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিমদের জন্য, ইসলামের নামে। পাকিস্তান আন্দোলনের একটি জনপ্রিয় শ্লোগান ছিল 'পাকিস্তান কা মাতলাব ক্যায়া, লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যদি ধরেও নেই, মুসলিম লীগ ইসলামের শ্লোগানকে স্রেফ রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের জন্য ব্যবহার করেছে, এরপরও বলা যায়, ইসলামের একটি আদর্শিক ভিত্তি ছিল। ইসলামী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দিকের উপর প্রাক-আধুনিক যুগে ১৪০০ বছর ধরে একটি বিশাল জ্ঞান ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। এর ছিল শক্ত জ্ঞানকান্ডিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি। পশ্চাতগতিশীলভাবে (retrogressively) অতীতের অন্ধ অনুকরণ না করে ইজতিহাদের সাহায্যে সৃষ্টিশীলভাবে আধুনিক যুগের আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে কিভাবে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করা যায় এটার উপরও মোটামুটি একটি নকশা ততদিনে ভারত উপমহাদেশে এবং এর বাইরে আরব-অনারব বিশ্বে বিভিন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও উলামাদের প্রচেষ্টার ফলে দাঁড়িয়ে যায়। তাই পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত পুরোপুরি কায়েম না হলেও, এ ব্যাপারে দাবী ও আন্দোলন কখনো নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি। অন্ততপক্ষে ১৯৫৬ সালে উলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানের সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয় এবং পাকিস্তানের আইন ও সমাজকে ধীরে ধীরে ইসলামীকরণের অঙ্গীকার করা হয়, যদিও এর প্রতিফলন পরবর্তীতে খুব একটা দেখা যায় নি। কিন্তু বাংলাদেশে সেটা হয় নি। বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ কেন, কোন জাতীয়তাবাদই আদর্শ হতে পারে না। জাতীয়তাবাদ কেবল একই জাতীয়তার জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে সমবেত করতে ব্যবহৃত হতে পারে। একইসাথে এর বিকাশের জন্য অন্য কোন জাতীয়তার জনগোষ্ঠীকে অপরায়ন করার প্রয়োজন পড়ে। তাই জাতীয়তাবাদকে উপাদানগতভাবে একটি নেতিবাচক ও প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ বলা যেতে পারে। এর দেয়ার মত কোন ইতিবাচক উপাদান নেই। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের এই আদর্শিক শূন্যতা বামপন্থীরা পূরণ করতে পারত এবং তারা চেষ্টাও করেছিল। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাদের অনেকেরই সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু চীন-সোভিয়েতের দ্বন্দে তারা এতটাই বিভক্ত হয়ে পড়েছিল যে, এ আদর্শিক শূন্যতা পূরণ করতে তারা ব্যর্থ হয়। ৭১-এর অব্যবহিত পরেই তারা বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে নব্য-বুর্জোয়া আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্বন্দে জড়িয়ে পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যকার দ্বন্দকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বামরাও পিকিংপন্থী ও লেনিনপন্থী এ দুভাগে ভাগ হয়ে পড়ে এবং এই দুভাগ থেকে পরবর্তীতে অনেক ভাগ সৃষ্টি হয়। এরা অনেকসময় নিজেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ত। ফলে বাংলাদেশে আদর্শিক শূন্যতা পূরণের মত রাজনৈতিক একতা কখনোই বামপন্থীরা হাসিল করতে পারে নি। অন্যদিকে সামাজিকভাবে তৃণমূল পর্যায়েও বাম মতবাদ কখনোই বাংলাদেশে শিকড় গাঁড়তে পারে নি। বামদের নাস্তিক্যবাদী দ্বান্দিক বস্তুবাদ বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের কাছে কখনোই

জনপ্রিয়তা পায় নি। বরং বাম মতবাদ ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া মধ্য ও কিছু উচ্চবিত্ত ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বুঝতে পারেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মপ্রিয়তার বিরুদ্ধে গিয়ে বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদকে ধরে রাখার কোন মানে হয় না। আর সেই চিন্তা থেকেই তিনি ৭২ এর সংবিধানের মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা সরিয়ে আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস সংযোজন করেন ও সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সংযোজন করেন। কিন্তু একে বড়জোর রাজনীতিকে আরো জনমুখী করার একটি পদক্ষেপ বলা যায়, যেটার মাধ্যমে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় চেতনা ও ঐতিহ্যকে কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দেয়া হয়। কিন্তু কোনভাবেই এটিকে বাংলাদেশের ইসলামীকরণ (Islamization) বলা চলে না। ইসলামীকরণের জন্য বাংলাদেশের আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনার প্রয়োজন তার কিছুই হয় নি। স্বয়ং বিএনপির সামনের সারির নেতৃবৃন্দের কেউই এটাকে ইসলামীকরণ বলবেন না এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া কিংবা নিজেদের ইসলামপন্থী হিসেবেও আখ্যায়িত করবেন না। এর প্রমাণ বছরখানেক আগে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম ভারতের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, বিএনপি শরীয়াহ আইনে বিশ্বাস করে না।[1] এছাড়াও জিয়াউর রহমান ও এরশাদের স্বয়ং ইসলামপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য বিদ্যমান।[2]

তবে, আশি ও নব্বইয়ের দশকে ইসলামপন্থী রাজনীতি যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠার পর থেকে, বিশেষ করে ইসলামপন্থী রাজনীতি দেশীয় রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি ও কিং মেইকার হয়ে উঠার পর থেকে বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ অপরায়নের জন্য নতুন শক্তি পেয়ে যায়। ইসলামপন্থীদের একাত্তরের পরাজিত শক্তির অবশিষ্টাংশ ও আদর্শের ধারকবাহক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিসর ও সিভিল সোসাইটিতে বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদীদের একচ্ছত্র প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও এবং গত ১৪ বছর ধরে তাদের সমআদর্শের রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও, ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে দমন-নিপীড়নের উপর রাখা সত্ত্বেও, দেশের জনগণের মাঝে ইসলামের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আলামতের বহিঃপ্রকাশ সেক্যুলার মহলকে চিন্তিত করে তুলেছে। মজার ব্যাপার হল, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী সেক্যুলারদের মধ্যে এই আদর্শিক শূন্যতার কারণে তারা অনেক আগেই পশ্চিমা গ্লোবালাইজেশনের সামনে পরাভূত। এই আদর্শের ধারকবাহকদের কিন্তু মোটদাগে পশ্চিমা লিবারেল সংস্কৃতি ও জীবনশৈলী অনুসরণ করতে দেখা যায়। উদাহারণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশী মেয়েদের একাংশের মধ্যে ব্যাপকহারে জিন্স, শার্ট

ইত্যাদি পশ্চিমা পোশাক পরার চল শুরু হলেও, সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিরা এসব নিয়ে টু শব্দটিও করেন না। কিন্তু দেশের মুসলিম নারীদের আরেকাংশের মধ্যে ব্যাপকহারে বোরখা পরিধান করার চলের বিরুদ্ধে কিন্তু তারা সচ্চোকিত। ৯/১১ এর পর থেকে অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের সেক্যুলার এলিট শ্রেণীর মতই বাংলাদেশের সেক্যুলার এলিটদেরও পশ্চিমাদের চালানো 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ' প্রজেক্টে কাতারবন্দী হওয়াটা তাই অবাক হওয়ার বিষয় নয়। যে গোষ্ঠীর নিজস্ব দর্শন নেই, তারা তো বিরাজমান শক্তিশালী দর্শনই অনুসরণ করবে – এটাই স্বাভাবিক।

বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবিদের অনেকেই ইসলামপন্থীদের 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'অন্ধবিশ্বাসী', 'যুক্তিবিরোধী' ইত্যাদি টিপিক্যাল গালিগালাজ না করে তাদের এই উত্থানের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ এটাকে ক্ষুদ্র বুর্জোয়া শ্রেণী বা কৃষক শ্রেণীর বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভের আলামত হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।[3] আবার কারো কারো মতে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের মধ্যে শহুরে সেক্যুলার র‍্যাশনাল ধারার সমান্তরালে যে গ্রামীণ মরমী ধারা অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, ৭১ এর পর গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার কারণে, এই ধারার বঞ্চনার অনুভূতি উদ্ভূত রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ইসলামপন্থা।[4] এসব তত্ত্বের একটি অভিন্ন দিক হল, ইসলামপন্থার উত্থানকে তারা একটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বা অস্বাভাবিক (anomaly) হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন; যেন রাষ্ট্র একটি দেহ আর তার পরিচালনায় বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ফোঁড়া হিসেবে ইসলামপন্থী রাজনীতি আজ বাড় বাড়ন্ত। ইসলামপন্থী রাজনীতির কোন ইতিবাচক উপাদান নিয়ে কোন আলোচনা করা হয় না। এটা অনেকটা অকল্পনীয় ভাবা হয় যে, ইসলামপন্থী রাজনীতির কোন ইতিবাচক উপাদানের জন্য আজ জনগণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ, বিশেষ করে, কলেজ-ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া (স্রেফ মাদ্রাসা পড়ুয়ারা নয়) শিক্ষিত অংশ ইসলামপন্থার দিকে ঝুঁকছে এবং এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ সংকট মুহূর্ত পার করছে বলে মত দিচ্ছেন স্বয়ং বাঙ্গালী সেক্যুলার বুদ্ধিজীবিরাই।

জীবন তাৎপর্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সিলসিলা

শাহবাগ ও শাপলা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে মাইলফলক ঘটনা কেন? স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে জনপরিসরে তথাকথিত স্বাধীনতার চেতনাধারী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামপন্থীদের

মধ্যকার দ্বন্দের বহিঃপ্রকাশ কখনোই এতটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এত বড় আকারে ঘটে নাই। এর আগ পর্যন্ত সেক্যুলার জাতীয়তাবাদীদের বলার সুযোগ ছিল যে, স্বল্প কিছু চরমপন্থী পথভ্রষ্টদের সমষ্টি হচ্ছে ইসলামপন্থীরা এবং জনমানুষের সাথে ইসলামপন্থীদের তেমন একটা সম্পর্ক নাই। কিন্তু শাপলা আন্দোলন এবং এতে সাধারণ মুসলিমদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফলে সেক্যুলারদের আর এই কথা বলার সুযোগ থাকল না। এর ফলে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সামনে আসে আর তা হচ্ছে, ইসলামপন্থা এমন এক আদর্শ যা ধারণ করার জন্য কোন ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে হয় না।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন ছোটকাল থেকেই আধুনিক কলোনিয়াল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা এবং জাতীয়ভাবে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী বয়ান ও রসমে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা একজন তরুণ প্রচলিত বয়ানের (dominant narrative) বাইরে গিয়ে ইসলামপন্থী আদর্শের গ্রাহক হয়ে উঠে? সচরাচর সেক্যুলারদের ইসলামপন্থা বিষয়ক একাডেমিক আলোচনায় ইসলামপন্থার রাজনৈতিক দিকটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উঠে আসে। এসব আলোচনায় ইসলামপন্থাকে সচরাচর জাতিবাদী/ পরিচয়বাদী রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়, যে অভিযোগ ইসলামপন্থী সাহিত্যের প্রাথমিক একনিষ্ঠ পাঠকমাত্রই নাকচ করে দেবে। ইসলামপন্থা যে পরিচয়বাদী রাজনীতি না সেটা স্রেফ এটা দেখিয়েই নাকচ করা সম্ভব যে, ইসলামপন্থী সাহিত্যে মুসলমান বংশীয় সূত্রকে মুসলমানিত্বের দার্শনিক বা আসল ভিত্তি আকারে হাজির করা হয় নি। বরং মুসলমানিত্বের জন্য আমলকে শর্ত হিসেবে হাজির করা হয়েছে। অনেকটা এভাবে বলা যায়, Islam is not a state of being, but a state of acting and becoming. ইসলামপন্থা এর কর্মীদের জন্য ঈমান আনাকে শর্ত হিসাবে পেশ করলেও, কখনোই স্রেফ বিদ্যমান মুসলিমদের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় নি। ইসলামপন্থা ইসলামের প্রস্তাবনা অমুসলিমদের সামনেও পেশ করে সক্রিয় ঈমানের দাওয়াতসহ এবং ঈমানের দাওয়াত ছাড়া (ঈমান না আনলে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দিয়ে)। যাই হোক, ইসলামপন্থা কেন পরিচয়বাদী রাজনীতি না এটা এ প্রবন্ধের মূল বিষয় নয়। ইসলামপন্থার কিছু সুস্পষ্ট দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা ও প্রস্তাবনা রয়েছে, যেগুলো তরুণদের ইসলামপন্থার কাতারের দিকে আকর্ষণ করে, যা আলোচনা করাই মূলত এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

প্রথমত আসে জীবনের তাৎপর্যের কথা। ইসলামপন্থা একজন তরুণের সামনে মেটাফিজিক্যাল, রূহানী, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ জীবনের বিভিন্ন দিককে একীভূত করে যে

সামগ্রিক অর্থ উপস্থাপন করতে সক্ষম, দার্শনিক দিয়ে চিন্তা করলে এর কাছেধারেও নাই বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ। উপরের এই বক্তব্যটা আমাদের সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতারাও বিভিন্ন ইসলামী অনুষ্ঠানে গিয়ে যে 'Islam is the complete code of life' কথাটা নামকাওয়াস্তে বলে আসেন, সেটার গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি নয়। আগেও বলা হয়েছে, বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ তার আদর্শিক শূন্যতার কারণে আজ পশ্চিমা লিবারেল পোষ্ট-ট্রুথ ওয়ার্ল্ডভিউয়ের পেটে ঢুকে বসে আছে। এ জীবনদৃষ্টিভঙ্গীর একটা বড় সমস্যা মানবজীবনের খন্ডীকরণ (compartmentalization). এ ওয়ার্ল্ডভিউতে মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হয়ে পড়েছে নিজস্ব যুক্তি ও জ্ঞানকান্ডে স্বনির্ভর ও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন (differentiated)। এমন কোন অক্ষ নেই যা জীবনের সমস্ত দিককে একই যোগসূত্রে আবদ্ধ করতে পারে। এর ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা ও কর্মকান্ডের মধ্যে যে অসামঞ্জস্যতা দেখা দিচ্ছে, তা পশ্চিমে মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতার বড় একটি কারণ। ইসলাম এ সমস্যা দূর করে। ইসলামে প্রকৃতির আইন (تكويني) ও নৈতিক আইনের (تشريعي) উৎস একই। এর ফলে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইসলামের দেয়া বিধান ঐ ক্ষেত্রের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। আবার জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে যে নৈতিক বিধান, সেটি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত নৈতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল, অনেকটা মেকানিক্যাল ঘড়ির বিভিন্ন যন্ত্রের মত, যেটির প্রত্যেকটি অংশ অন্য অংশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার কারণে পুরো ঘড়ি সঠিকভাবে কাজ করে থাকে। এটা একজন ইসলামপন্থীর রুহানীয়াত ও জ্ঞানকান্ডের মধ্যে ঐকতান সৃষ্টি করে তাকে মানসিক স্থিরতা দান করে।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি লক্ষ্যণীয় সেটি হচ্ছে, সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দিকটি (The notion of belonging to a community)। ইসলামপন্থা এর ধারককে জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে সুবিশাল, সীমানাবিহীন এক প্রাণবন্ত বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত করে। এ সংযোগ রাজনৈতিক তো বটেই, সেই সাথে রুহানী ও মানসিকও। বৈশ্বায়নের ফলে এই সংযোগ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর কল্যাণে অনেক শরীরীও (Tangible)-ও হয়ে উঠেছে। যে কোন সম্প্রদায় স্রেফ গোষ্ঠীবদ্ধতা নয়, এর সাথে থাকে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভবিষ্যত। মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক চরিত্রকে কোন মূর্খই অস্বীকার করতে পারবে। ওসমানী খেলাফতের পতন তো মাত্র ১০০ বছর আগের ব্যাপার, যেটার ঢেউ বাংলা মুলুকেও খিলাফত আন্দোলন আকারে আঁছড়ে পড়েছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের এই রাজনৈতিকতার রয়েছে ১৪০০ বছরের অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস; এর মূখ্য শ্রদ্ধেয় অনুসৃত ব্যক্তিদের [মহানবী (দ) এবং খুলাফায়ে রাশিদীন] সকলেই রাজনৈতিক; এর ইতিহাসে যে বিজয়

গৌরব আছে এর একটা বিশাল অংশ রাজনৈতিক (যেমন: ক্রুসেডার ও মঙ্গোল আগ্রাসকদের পরাজিতকরণ); এমনকি এই সভ্যতার বিজয়গাঁথার যেসব দিক ও ব্যক্তিত্বের চরিত্র সরাসরি রাজনৈতিক নয়, পরোক্ষভাবে তারাও রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা এড়াতে পারে নি। যেমন ধরা যাক, ইমাম গাজালীর কথা, যিনি মূলত ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রে বিশেষ করে দর্শন, তাসাওউফ ও ফিক্বহে অসাধারণ অবদান রাখার জন্য মুসলিম ইতিহাসে স্মরণীয়। অনেকে সমকালীন ক্রুসেড আক্রমণের প্রতি তাঁর বেখেয়ালী মনোভাবের দিকটি তুলে ধরে তাঁকে অরাজনৈতিক ঠাওরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু বাতেনীদের দার্শনিক খন্ডন, সেলজুক উজিরে আযম নিজামুল মুলকের সাথে সহযোগিতা এবং নৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে পরবর্তীতে সালাহউদ্দীনের বিজয়যাত্রা সহজ করার পিছনে তাঁর যে ভূমিকা, সেটাকে কোনভাবেই এড়ানো যায় না। মুসলিমদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্বর্ণযুগের কথা অনেক স্মরণ করা হয়, সেটাও আব্বাসী 'খেলাফত'-এর অস্তিত্ব ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

মুসলিম ইতিহাসের একনিষ্ঠ তরুণ একজন পাঠক, যে মুসলিম সাবজেক্টিভিটি নিয়ে এই ইতিহাস পাঠ করে থাকে, সে এই ইতিহাস পড়ে কখনো হাসে, কখনো কাঁদে। আর এই প্রতিটি মুহূর্তেই সেই পাঠক মুসলিমদের এই উত্থান-পতনের সাথে কোরআন-সুন্নাহর প্রতি তাদের আনুগত্য ও অঙ্গীকারের উঠানামার এক যৌক্তিক সম্পর্ক খুঁজে পায়। ইতিহাস পঠনের মাধ্যমে এ পাঠক অতীতে ভ্রমণ করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে ও নিজের মুসলিম সাবজেক্টিভিটিকে পোক্ত করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাথেয় খুঁজে নেয়। এজন্যই আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইসলামী প্রতিরোধ শক্তির বিজয়, ফিলিস্তিন-কাশ্মীর সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতাকামী প্রতিরোধ শক্তির সফলতা, তুরস্কে এরদোয়ানের জয় – এসবই তাকে আনন্দে উদ্বেলিত করে তুলে। একইভাবে মিশরে মুরসীর ফাঁসি, সিরিয়ায় আসাদের গণহত্যা দেখে সে দুঃখিত হয়ে উঠে। আবার সে দেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুসলিমরা বাংলাদেশে শাপলা গণহত্যা ও ইসলামী রাজনৈতিক নেতাদের উপর ফাঁসি-নির্যাতন-জুলুম দেখে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। এই যে রূহানীয়াত, রাজনৈতিকতা, ঐতিহাসিকতার এই তীব্র ও প্রাণবন্ত সম্মেলন এবং বর্তমানকালেও এর চলমানতা ও প্রাসঙ্গিকতা একজন ইসলামপন্থীকে চিন্তা ও অনুভূতির জগতে যে প্রসারতা, স্থিরতা ও উদ্দোম দিতে সক্ষম এর মোকাবেলা করার সক্ষমতা কি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের রয়েছে? এ মতের ধারকবাহকগণ নিজ দেশের মুসলিমদের বৈশ্বিক উম্মাহ-সচেতনতা তথা বিদেশী মুসলিমদের প্রতি উদ্বেগ ও চিন্তা দেখে তাদের পশ্চিমা গুরুদের সুরে সুর মিলিয়ে খালি পারেন সালাফী-ওহাবীবাদের-ইসলামপন্থার প্রচার প্রসারে 'সব গেল তল' রব তুলতে! অবশ্য

বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের কালচারাল সিম্বল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-ও তাঁর 'বর্তমান হিন্দু-মুসলিম সমস্যা' বইতে স্বদেশী মুসলিমদের খিলাফত আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা দেখে তাদের উপর একইরকম ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছিলেন: "হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ । সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই । মুসলমান মুখ ফিয়াইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে , এদেশে চিত্ত তাহার নাই। "

যাই হোক, বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বয়ান পোক্ত করার জন্য 'হাজার বছরের বাঙ্গালী ঐতিহ্য'-এর মত কল্পকাহিনী নির্মাণ করল, যদিও তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি মতেই, বাঙ্গালীর জাতি হিসেবে আত্মসচেতনতার সূচনা হয় ৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে। আবার হাজার বছরের বাঙ্গালী ঐতিহ্য নামক কল্পকাহিনী প্রতিষ্ঠা করার জন্য হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীদের এমন তালিকা বানানো হয়, যেটার অসামঞ্জস্যতাও বিরক্তির উৎপাদন করে। এ তালিকায় ব্রিটিশ ও জমিদারবিরোধী তিতুমীর ও হাজী শরীয়তউল্লাহর মত ব্যক্তিত্বদের সাথে ব্রিটিশ অনুগত ও জমিদারশ্রেণীর মিত্র ভদ্রলোক শ্রেণীভুক্ত বাঙ্গালী কলকাতার রেনেঁসার ফিগারদের এনে জড়ো করা হয়। এ তালিকায় থাকা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরসহ সমশ্রেণীভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ বেঁচে থাকলে এ তালিকা দেখে হয়তো নিজেদের চুল ছিঁড়তেন এবং তিতুমীর ও শরীয়তউল্লাহর মত 'জিহাদী'-দের সাথে কেন তাদের একই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলতেন। আবার ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি যদি দ্বি-জাতি তত্ত্বের নাকচ হয়ে থাকে, যেমনটি কিনা বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদীরা দাবী করে থাকে, তাহলে হোসেন মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দী কিভাবে এই তালিকায় স্থান পান, যিনি পাকিস্তানের প্রতি অনুগত থেকেই মৃত্যুবরণ করেন। এরকম হাজারো অসঙ্গতিতে ভরা হাজার বছরের বাঙ্গালী ঐতিহ্যের কল্পকাহিনী তথা সেক্যুলার জাতীয়তাবাদীদের ঐতিহাসিক বয়ান। ইসলামপন্থীদের উপস্থাপিত সুসঙ্গতিশীল ও প্রাণবন্ত ঐতিহাসিক বয়ানের সামনে কি বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের এই নড়বড়ে ঐতিহাসিক বয়ান দাঁড়াতে পারে?

এখানে আনুষঙ্গিক আলোচনা হিসেবে সংস্কৃতি-র আলোচনা এসে যায়। বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদীরা বলে থাকতে পারেন, মুসলিম উম্মাহর এই রাজনৈতিকতা ও রাজনৈতিক ঐক্যের সম্ভাবনা একটা অলীক কল্পনা মাত্র, কারণ উম্মাহ বলতে যে জিনিসটা বোঝানো হয় সেটা মূলত বহু-সংস্কৃতির লোকের সমষ্টি। আর এই সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণেই উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্য সম্ভব নয়। এ আপত্তি মূলত পাকিস্তানের ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তারা যে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক

অমিলের কথা প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন, সেটারই ইসলামপন্থার উত্থানের প্রেক্ষিতে অল্প ঘষেমেজে পুনঃহাজিরীকরণ। আমরা যদি ক্লিফোর্ড গির্টজের সংস্কৃতির এই সংজ্ঞায়ন "(Culture is) a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life."[5] আমলে নেই, তাহলে বুঝতে পারব যে, বিভিন্ন অঞ্চল, ভাষাভাষী ও নৃতাত্ত্বিকতার মুসলিমদের খাদ্য, পোষাক, ভাষার মত সংস্কৃতির সবচেয়ে পৌনঃপুনিক (frequent) ও প্রকাশিত অভিব্যক্তিগুলোর বাহ্যিক রূপে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, তাদের সংস্কৃতিসমূহের মর্ম ও গাইডিং প্রিন্সিপাল যে ঐ ইসলামই। বাঙ্গালী পুরুষের পরিহিত পাঞ্জাবী, খাইবার পাখতুন এলাকায় পুরুষের পরিহিত কুর্তা, মালয় পুরুষের পরিহিত বাজু কুরুং এবং উত্তর ও পশ্চিম আফ্রিকায় মুসলিম পুরুষদের পরিহিত বুবু-র বাহ্যিক ডিজাইনের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এদের মর্ম একই আর তা হচ্ছে এসব পোশাক সতর ঢেকে রাখে ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী ঢিলাঢালা। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের দৈনিক খাদ্যের স্বাদ, ঘ্রাণ ও রঙে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এগুলোর সবই হালাল-হারামের নিয়ম মেনে চলে। এজন্য মুসলিম ইতিহাস সাক্ষী, যে যুগে মুসলিমরা আর একক সাম্রাজ্যের অধীনে না থেকে বহু সালতানাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, সে যুগেও এক অঞ্চলের মুসলিম জ্ঞান অন্বেষণ কিংবা জীবিকার খোঁজে দূরবর্তী অন্য কোন মুসলিম অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং খুব সহজেই সেখানকার সংস্কৃতিতে অল্প সময়ের মধ্যে মানিয়ে নিতে পেরেছে। এখনও সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি অঞ্চলের মুসলিম সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দে একে অপরের প্রস্তুতকৃত খাদ্য খেতে পারবে, কারণ তারা জানে, তাদের মুসলিম ভাইয়ের খাবার সম্পূর্ণ হালাল। এই জাতীয়তাবাদী সীমানা বিভক্তির যুগেও, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ, যেখানে শিক্ষা ও চাকুরীর জন্য বিভিন্ন সংস্কৃতির ও জাতীয়তার মুসলিম একত্রিত হয়, সেখানে এখনো আন্তঃসাংস্কৃতিক মুসলিম বিয়ে অহরহ হয়ে থাকে। অভিন্ন ইবাদত এবং সামাজিক-নৈতিক মূল্যবোধসমূহ একতা সৃষ্টিতে যে গভীর ভূমিকা রাখে সেদিকে আর নাইবা গেলাম। কিন্তু এখনো স্বয়ং বাংলাদেশের মধ্যেই কোন বাংলাদেশী হিন্দু ও বাংলাদেশী মুসলিম একে অপরের বাসায় স্বাচ্ছন্দে খাওয়া-দাওয়া করতে সক্ষম হবে না খাদ্য সংক্রান্ত তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় বিধিনিষেধের জন্য। বিয়ের ব্যাপারেও একই কথা। আর এর একটাই কারণ আর তা হচ্ছে তাদের জীবন-দর্শন ও সভ্যতার মূল্যবোধের পার্থক্য। ঠিক একইকারণে একজন ইসলামপন্থী ও একজন সেক্যুলার সচরাচর নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করতে চাবে না।

অবশ্য সেক্যুলাররা এই অচলাবস্থা নিরসনের একটি উপায় খুঁজে পেয়েছে। ইসলামকে ব্যক্তিপরিসরে সীমাবদ্ধ করার বয়ান দেয়ার পাশাপাশি দেশের সংখ্যাগুরু জনগণের উপর তাদের দ্বীন ইসলামের প্রভাবকে লঘুকরণের উপায় হিসেবে পশ্চিম বাংলাজাত বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্মীয় রসম-রেওয়াজকে অনেকটা নির্ধর্মীকরণকৃত (detheologized) আকারে রাষ্ট্রীয় আইন ও পৃষ্ঠপোষকতা সহকারে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। মঙ্গল শোভাযাত্রা, মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো, শিখা চিরন্তন, বিভিন্ন বেদীসদৃশ জাতীয় স্তম্ভের উপর পবিত্রতা আরোপ করে সেখানে পৌত্তলিক পূজার আদলে ফুল অর্পণ ইত্যাদিকে জাতীয় সংস্কৃতি বানিয়ে নিয়েছে। এ তো সামান্য কিছু উদাহরণ। এসবের বাইরে গিয়ে যখন ইসলামপন্থা প্রভাবিত সংস্কৃতির উত্থান হয় তখন এই বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদীগণ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে হুমকির সম্মুখীন মনে করতে থাকেন। একই ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও তারাই ইসলামপন্থীদের সংস্কৃতিকে মেনে নিতে পারেন না। যাই হোক, মূল কথা হচ্ছে, ভাষা অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ার শক্তিশালী মাধ্যম হলেও, তা কখনো এর মূল ভিত্তি হতে পারে না। এ থেকেও দেখা যাচ্ছে, ইসলামপন্থা রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে যা প্রস্তাব দিচ্ছে তা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভাষিক ভিত্তির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

শাপলা আন্দোলন এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর ফলাফল ও পরিণতি জনপরিসর ও গণমানুষের সমাজে এত শক্তিশালীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, ইসলামপন্থার রাজনৈতিকতার অতিরিক্ত মাত্রাগুলো স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এ ফেনোমেননকে বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবিগণও এড়াতে পারেন নি এবং এটাকে বাঙ্গালী সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের সংকটের ফলাফল হিসেবে তুলে ধরেছে। স্বীকার করতেই হবে, এই সংকট তাদের এই সহজ স্বীকারোক্তি সহিহ।

---

[1] বিএনপি শরীয়াহ আইনে বিশ্বাস করে না: মির্জা ফখরুল, link

[2] জিয়াউর রহমানের উক্তি: "কোন রাজনৈতিক আদর্শ ধর্মকে ভিত্তি করে হতে পারে না। একটা অবদান থাকতে পারে। কিন্তু ধর্মকে কেন্দ্র কখনওই রাজনীতি করা যেতে পারে না"। .. .. ধর্মের অবদান থাকতে পারে রাজনীতিতে, কিন্তু

রাজনৈতিক দল ধর্মকে কেন্দ্র করে হতে পারে না। এটা মনে রাখবেন, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ"। (তারেক রহমান: অপেক্ষায় বাংলাদেশ। সম্পাদকবৃন্দ: এমাজউদ্দীন আহমেদ, মাজেদুল ইসলাম, শওকত মাহমুদ এবং আব্দুল হাই শিকদার। প্রকাশক: জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন, ঢাকা। প্রকাশ: ২০১০। পৃষ্ঠা- ৩৮৯)

[3] Taj I. Hashmi, 'Islamic Resurgence in Bangladesh: Genesis, Dynamics and Implications' in 'Reigious Radicalism and Security in South Asia'. Ed: Satu P. Limaye, Mohan Malik, Robert G. Wirsing. Asia-Pacific Center For Security Studies. Honolulu, Hawaii. 2004. 41, 69.

[4] বদরুল আলম খান, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ: চার দশক পর, প্রতিচিন্তা, link:

[5] Clifford Geertz. The Interpretation of Culture. Basic Books, Inc., Publishers. New York. 1973. 89